২৬ মার্চ ২০১৮: স্বাধীনতা দিবসে আমরা কী করব? স্বাধীনতা বলতে কী বুঝব?

পরমতসহিষ্ণুতাই হোক সমাজ বদলের হাতিয়ার

স্বাধীনতা কী?

বাঙালি স্বাধীনচেতা জাতি- এমন কথা আমরা প্রায়ই বলতে শুনি। আসল কথা হল, কোনো জাতিই পরাধীনতা পছন্দ করে না। স্বাধীনতা অর্জন যেহেতু ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, 'স্বাধীনতা' শব্দটির অনুধাবন যেহেতু মানুষের রাজনৈতিক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, তাই অনেক জাতি বছরের পর বছর পরাধীন থাকে। অন্যের দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত হয়।

স্বাধীনতা শব্দটির দুইটি দিক আছে- একটি ব্যক্তিগত অন্যটি জাতিগত। প্রতিটি প্রাণীরই এক ধরনের স্বাধীন ইচ্ছা থাকে। যা ইচ্ছা তাই করার অভ্যাস থাকে। তবে, অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ অধিকতর যুক্তি দ্বারা চালিত। ইংরেজিতে বলা হয় Rational। মানুষ যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। তার যে কোনো কাজের পেছনে একটা যুক্তি থাকা উচিত। যখন মানুষ অযৌক্তিক কাজ করতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় স্বেচ্ছাচারী। তখন তার আচরণ অন্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা

কাজেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বশীলতার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। স্বাধীনতা মানে আমি যা ইচ্ছা তা করতে পারি না। গভীর রাতে আমি উচ্চ শব্দে গান বাজাতে পারি না- যতই আমার গান শুনতে ইচ্ছা করুক। কারণ, এতে অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে, অসুস্থ মানুষের ক্ষতি হতে পারে। কাজেই এটা স্বাধীনতা নয়। অন্য ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি না করে, কারো অনুভূতিতে আঘাত না করে নিজের বৈধ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটানোই স্বাধীনতা। অবৈধ কোনো ইচ্ছাকে স্বাধীনতা বলে না, সেটা স্বেচ্ছাচারিতা।

স্বাধীনতা দিবস

২৬ মার্চ বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। পাকিস্তানি শাসকদের পরাধীনতা অস্বীকার করে আমরা ১৯৭১ সালের এই দিনে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করি। যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, আমরা অভ্যাসবশে স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি বা বিজয় দিবস পালন করি। আমাদের বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এসব দিবস সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই রাখে না। শুধু অজ্ঞতাই এর পেছনে দায়ী নয়, বিষয়টা সম্পর্কে ভালোভাবে জানার ব্যাপারে একটা সাধারণ অনাগ্রহও একটি বড় কারণ। এ বছর স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রাক্কালে তাই এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে আমরা জানতে চেষ্টা করব।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি

আমরা জানি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরই চারটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমাদের সংবিধান রচিত হয়। সেগুলো হচ্ছে- জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। প্রতিটি বিষয় অনেক ব্যাপক এবং পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য বিস্তর পড়াশোনা দরকার। তবে, আমরা চেষ্টা করব বিষয়গুলোর মূল ভাব অনুধাবন করতে এবং সেই সাথে আরো বিশ্লেষণের জন্য নিজের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি খোলা রাখতে।

জাতীয়তাবাদ

সরলভাবে বললে, একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থানে একটি নির্দিষ্ট জাতি গড়ে ওঠে। ভূখন্ডের জলবায়ু ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিবর্তনের ভিত্তিতে সে জাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। একারণেই আমরা স্থানভেদে সাদা, কালো, বাদামী, লম্বা, খাটো, সোনালী চুল, কোঁকড়ানো চুল ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের মানুষ দেখি। স্থানান্তর ছাড়া আফ্রিকায় আমরা সোনালী চুলের সাদা মানুষ দেখি না কিংবা চীনে আমরা কালো বা বাদামি মানুষ দেখি না। আলাদা আলাদা ভুখন্ডে বসবাসরত মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য উৎপাদন, পোষাক, ভাষা, পারম্পারিক সম্পর্ক ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের সমাজ ও সামাজিক নিয়ম গড়ে ওঠে। এগুলো ভৌগলিক অবস্থান, প্রকৃতি ও জলবায়ু অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ইচ্ছামতো কেউ পছন্দ করে নিতে পারে না। যেমন, এস্কিমোরা চাইলেই বিষুবীয় অঞ্চলের মতো ঢিলাঢালা পাতলা পোষাক পরতে পারে না। চামড়ার পোষাক পরা তাদের আবহাওয়ার সাথে মানানসই ও প্রয়োজন। নিজেদের প্রয়োজনে একটি জাতি ধীরে ধীরে এসব ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন আনে। এর উপর যুক্ত হয় ধর্ম, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ইত্যাদি। এর প্রভাবেও জাতিতে বা সমাজে, সংস্কৃতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে।

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট জাতির আত্মপরিচয় নিয়ে মর্যাদার সাথে প্রকাশিত হওয়া। একটি পরাধীন জাতি তা করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা বাঙালি হলেও পাকিস্তানী শাসন আমলে বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানি হিসেবে পরিচিত হতে বাধ্য হয়েছি। এতে আমাদের জাতিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। একারণেই আমরা স্বাধীন হতে চেয়েছি। একটি জাতি হিসেবে আমরা আমাদের আত্মপরিচয় হারিয়ে যেতে দিতে চাইনি। এটা আমাদের অধিকার।

স্বাধীন দেশে বাঙালি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে, এই দেশে আরো অনেক জাতিসত্তা রয়েছে। সাঁওতাল, চাকমা, মগ, গারো, ম্রো, খুমি, মনিপুরী এমন আরো অনেক জাতি এখানে বসবাস করে। ঠিক যে কারণে আমরা পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়েছি, সেই একইভাবে আমরা যদি অন্য জাতিসত্তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করি, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা তার মর্যাদা হারায়। আমরা এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে গর্বের সাথে অবস্থান করতে চাই, যেখানে প্রতিটি জাতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমেই আমরা জাতীয়তাবাদের চর্চা করব। আমার জাতীয়তাবাদ কখনই অন্য জাতিকে হেয় করবে না। আমার ভাষা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী এমন কোনো নিয়মকানুন চালু করব না যা অন্য জাতির, সংস্কৃতির বা ধর্মের মানুষের জন্য অস্বস্তিকর হয়। এটাই জাতিগত নিপীড়ন। উগ্র জাতিয়তাবাদের মধ্য দিয়ে তা অনেক সময় প্রকাশিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা

আমরা অনেক সময় ধারণা করি, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা। এটা ঠিক নয়। বরং, সকল ধর্মকে সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করাই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। সংখ্যায় কম বেশি যাই হোক, বাংলাদেশে নানা ধর্মের নাগরিক রয়েছেন। রাষ্ট্রের প্রতি তাদের প্রত্যেকের যেমন সমান দাবি আছে, অধিকার আছে, তেমনি রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সমানভাবে বিবেচনা করার। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে অধিকার প্রদান করতে রাষ্ট্র বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। পরাধীন অবস্থায় বৈষম্যের শিকার ছিলাম বলেই আমরা একটা বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য যুদ্ধ করেছি, স্বাধীন হয়েছি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্ম খারাপ জিনিস নয়। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, প্রতিটি ধর্ম মানুষের কল্যানের জন্য নিবেদিত। কোনো ধর্মে অকল্যান নেই। পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি ধর্মের অবদান রয়েছে। এগুলো ধর্মের ইতিবাচক দিক। কিন্তু নির্দিষ্ট স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার, ক্ষেত্রবিশেষে ধর্ম অনুযায়ী সুযোগ গ্রহন শুধু অন্যায়ই নয়, রীতিমতো গর্হিত। এক ধর্মের মানুষের কাছে অন্য ধর্মকে মিথ্যা বা হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা মানেই অন্য ধর্মকে অবমাননা করা। সেটা অবশ্যই বর্জনীয়।

নিজ নিজ ধর্ম পালনের পাশাপাশি অন্যকে তার ধর্ম পালনে বাধা না দেয়া এবং তার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়াটাই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা। স্বাধীনতার চেতনার এটি মূল উপাদান। আমাদের চর্চা হবে, অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করা এবং পাশাপাশি যুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর একটি সামাজিক আচরণ প্রতিষ্ঠা করা যাতে সকল মানুষের কল্যান হয়। এটিই সেক্যুলারিজম।

গণতন্ত্র

একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে জনগণের সকল অংশের সমতাপূর্ণ অংশগ্রহনই গণতন্ত্রের মূল কথা। গণ মানে মানুষ, সকল সাধারণ মানুষ, যাকে অন্য কথায় জনগণ বলা হয়। আর তন্ত্র মানে ব্যবস্থা। জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের শাসনকেই গণতন্ত্র বলা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জনগণ বলতে আমরা কী বুঝব?

অনেক সময় আমরা মনে করি, বেশিরভাগ মানুষের সিদ্ধান্তই গণতন্ত্র। কথাটা এক অর্থে ঠিক হলেও এর মধ্যে কিছুটা ফাঁকিও রয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হচ্ছে বাঙালি। তাহলে, শুধু বাঙালির সিদ্ধান্তই কি চূড়ান্ত বলে আমরা মেনে নেব? তা যদি হয়, তাহলে সাঁওতাল, চাকমা, মনিপুরী, গারো এদের কথা আর শোনার অবকাশ থাকে না। যা গণতন্ত্রের চেতনার পরিপন্থী। এটি একইভাবে ধর্ম, ভাষা, পোষাক, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আমাদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় আচরণে এমন কোনো উপাদান থাকবে না, যা কোনো সংখ্যালঘু জাতি, ধর্ম বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মানুষকে বঞ্চিত করে, বিচ্ছিন্ন করে বা বহির্ভূত করে। এটিই আমাদের স্বাধীনতার চেতনা। এমন গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্যই আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি, অনেক জীবনের বিনিময়ে তা অর্জন করেছি।

সমাজতন্ত্র

'সমাজতন্ত্র' বলতে একটি নাম পৃথিবীতে চালু আছে। আমরা অনেক সময় পুরোপুরি না বুঝেই একটা নামের ভিত্তিতে তা বিবেচনা করি। কিন্তু আমরা যদি বিষয়টি বিশ্লেষণ করি তাহলে বেশ কিছু বিষয় জানতে পারব।

সমাজতন্ত্র কোনো ধর্ম বা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের ইশতেহার নয়। এটি মূলত একটা সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের ধরন। 'উৎপাদন সম্পর্ক' কথাটির মানে হচ্ছে, একটি উৎপাদন ব্যবস্থায় দুইটি পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক। কলকারখানায় মালিক ও শ্রমিক, কৃষিতে ভূমি মালিক ও কৃষি শ্রমিক এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের দুই পক্ষ। সাধারণ ব্যবস্থায় এই সম্পর্কটি থাকে দ্বন্দ্বমূলক। একজন আরেকজনের প্রতিপক্ষ হয়ে থাকে। কারণ, এই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিক ক্রমাগত ধনী হয় আর শ্রমিক ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হয়। এ কারণেই তা দ্বন্দ্বমূলক। পৃথিবী থেকে বৈষম্য দূর করতে হলে এই উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন আনতে হবে।

সমাজতন্ত্র হচ্ছে, উৎপাদন ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কারখানা বা উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানার মধ্যে মালিকের পাশাপাশি শ্রমিকের অংশিদারী প্রতিষ্ঠা করা। বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করা যাক। আমরা সাধারণভাবে দেখি, একজন মালিক তার সম্পদ দিয়ে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই তার শতভাগ মালিকানা আমরা বিনা প্রশ্নেই মেনে নেই। কিন্তু, একজন ব্যক্তির পক্ষে কোনো সম্পদে শতভাগ মালিকানা থাকা সম্ভব নয়। সেই সম্পদ অর্জনে অনেক মানুষের অবদান রয়েছে, অনেক জনসম্পদের ভাগ রয়েছে- যা স্বীকার করা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল থেকে পাশ করে বেরুতে আমাদের তেমন কোনো ব্যয় করতে হয় না। কারণ, সেই ব্যয়ের জোগান দেয় দেশের সাধারণ মানুষ। এমনকি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে অর্জিত ডিগ্রিতেও অনেক মানুষের তথা সমাজের পরোক্ষ অবদান থাকে যা ছাড়া আপনার পক্ষে ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব নয়। এখানেই নিহিত আছে সামাজিক মালিকানার যুক্তি।

আবার, কারখানায় একজন শ্রমিক যা দেন তার বিনিময়ে তিনি যত মজুরিই পান তা দিয়ে তার শ্রমের মূল্য শতভাগ পরিশোধ হয় না। কারখানায় শ্রমিক যে শ্রম দেন তার মধ্যে তার জীবন, সময়, মেধা, ধৈর্য, সততা এমন অনেক পরিমাপ-অযোগ্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে যা মজুরি দিয়ে পরিশোধযোগ্য নয়। কাজেই সেটা তার পক্ষ থেকে বিনিয়োগ। আর্থিক না হলেও এই বিনিয়োগ ছাড়া কারখানা চলা সম্ভব নয়।

কাজেই সেগুলো বিবেচনায় নেয়া সম্ভব শুধুমাত্র সেই কারখানায় তার মালিকানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। একেই বলে সামাজিক মালিকানা। একমাত্র এ ব্যবস্থায়ই সম্ভব কারখানার লাভ হওয়া মানে শ্রমিকের লাভ হওয়া। এভাবেই সমাজের বৈষম্য হ্রাস পায়।

সর্বোপরি, সমাজতন্ত্র মানে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র কাঠামোর অবলোপন ঘটা ও তার স্থলে সমাজ শক্তিশালী হয়ে ওঠা। সমাজের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হয় বলেই একে সমাজতন্ত্র বলা হয়।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক হচ্ছে, পাকিস্তান আমলে আমরা যে বৈষম্যের শিকার হয়েছি তা থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আমাদের লক্ষ্য তাই ছিল সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ। সে কারণেই আমরা সমাজতন্ত্রকে আমাদের রাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহন করেছি।

স্বাধীনতা দিবসে আমাদের করণীয়

আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন শুধু স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। আমরা স্বাধীনতা কথাটির অর্থ উপলব্ধি করতে চাই। একজন যুক্তিনির্ভর মানুষ হিসেবে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করতে চাই। স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতার পরিপন্থী আচরণ থেকে মুক্ত হতে চাই।

আমরা সকলেই চাই দেশের উন্নতি। এর জন্য সবচেয়ে প্রাথমিক কাজ হচ্ছে নিজের পরিবর্তন। ব্যক্তির পরিবর্তন মানেই সমাজ পরিবর্তন। সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে যুক্তিনির্ভর মানুষ, যারা বিজ্ঞানভিত্তিক ও জ্ঞান নির্ভর। যারা স্বাধীনতার প্রকৃত চেতনা ধারণ করে ও সমাজে তার চর্চা করে।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমরা উপরে বর্ণিত প্রতিটি বিষয় অনুধাবন করব। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব। নিজেদের আচরণে আমরা যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখব তা হচ্ছে-

- সকল ক্ষেত্রে যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া, বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো।
- অন্যকে জাতিগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, শারীকির বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গ ইত্যাদি সকল পরিচয়ের উর্ধে রেখে মানুষ হিসেবে সম্মান করা ও তার অধিকার পেতে সহায়তা করা।
- সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসেবে বাঙালির দায়িত্ব বেশি। তাই অন্য জাতিসত্তার মানুষকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া ও তার অধিকার চর্চার সুযোগ করে দেয়া তাদের দায়িত্ব। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই আচরণ প্রযোজ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে মুসলিমদের দায়িত্ব বেশি। তবে, অন্যরাও এই চর্চায় অংশগ্রহন করবে।
- স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতা পরিপন্থী সকল আচরণ পরিহার করা।
- সামাজিক বৈষম্য বিলোপে ভূমিকা রাখা।
- সকল ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া। নিজ ধর্ম পালন অক্ষুণ্ন রেখে সকল ধর্মকে সম্মান করা, কিন্তু ধর্মের কোনো স্বার্থান্বেষী ব্যবহার ও সুযোগ গ্রহনকে নিরুৎসাহিত করা।
- ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক সেক্যুলারিজমের চর্চা উৎসাহিত করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহনে সকলের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
- গণতন্ত্রে সকল মত ও দল গুরুত্বপূর্ণ। ভিন্নমতকে সম্মান করা ও পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা প্রতিষ্ঠা করা।

পরিশেষে, একটি উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কোস্ট ট্রাস্ট উপকূলীয় দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে। আমাদের লক্ষ্যও হচ্ছে সমাজের বৈষম্য দূর করা, সমাজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা। এটি করার জন্যই আমরা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে আস্থা রাখি এবং তার সাথে আমাদের কাজের সমন্বয় করি। আমরা কোস্টের কর্মী হিসেবে আমরা সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির সাথে একমত পোষণ করি এবং সকল অবস্থায় তা অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট থাকি। আমরা তাই বিশ্বাস করি, সংগঠনের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার মাধ্যমে সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করাও স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রতি আমার দায়বদ্ধতার প্রকাশ। আমরা তাই সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, ইতিবাচক জাতিয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধ ধারণ করব। যুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর সেক্যুলারিজমের চর্চা করব। এটাই হোক আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গীকার।

কোস্ট ট্রাস্ট, প্রধান কার্যালয়, বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

স্বাধীনতা দিবসে কোস্ট ট্রাস্ট কার্যালয়ে দলীয়ভাবে পাঠ ও বিশ্লেষণের জন্য এই লিফলেট গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে। লিফলেটটি বাইরে প্রচারের জন্য নয়। নিজেদের অনুশীলনের জন্য। নিজেদের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নই এর উদ্দেশ্য। আগ্রহী পাঠক এ বিষয়ে প্রয়োজনে আরো অনুসন্ধান করবেন।